গবাদিপশুর কৃমি রোগ দমন মডেল

ভূমিকা

গবাদিপশু যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার বিভিন্ন ধরনের রোগের মধ্যে পরজীবী একটি ক্ষতিকর রোগ। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পরজীবীর বংশ বিস্তারে সহায়ক বলে বাংলাদেশের গবাদি পশুতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি এবং এই রোগের কারণে প্রতি বছর প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। গবাদিপশুতে পরজীবীর ডিম বা লার্ভা খাদ্যের সাথে বা দেহ ত্বক ভেদকরে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

অনেক সময় মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় পশু পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। পরজীবী গবাদিপশুর জন্য সর্বদাই ক্ষতিকর। এরা পশুর দেহের রক্ত শুষে খায় এবং খাদ্য ও পুষ্টির মধ্যে ভাগ বসায়। এছাড়া, পরোক্ষভাবেও এসব পরজীবী বিভিন্ন পরিপাকযোগ্য খনিজ শুষে নেয়। এর ফলে পশুর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কৃমিনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য উপকারী অনুজীব ধ্বংস না করে পরজীবীর ধ্বংস সাধনই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

কৃমিনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি

ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরজীবীনাশক যে কোনো উৎকৃষ্টমানের ঔষধ বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমান বাজারে অনেক প্রতিষ্ঠান এসব ঔষধ বাজারজাত করে থাকে। কৃমিনাশক থেকে সর্বোত্তম ফল পেতে হলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পশুর ওজনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। কৃমিনাশক প্রয়োগের জন্য বছরে দুইটি কৌশলগত মাত্রা প্রত্যেকটি পশুর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। একটি মাত্রা শরতের শেষে (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) অন্যটি বর্ষার শুরুতে (মে-জুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে।

কৃমিরোগ প্রতিরোধের কর্মপন্থাসমূহ

- পরজীবী বহুল এলাকায় প্রথমে সকল গবাদিপশুকে পরজীবীর জন্য সর্বাত্মক চিকিৎসা (Mass treatment) দিতে হবে।
- এর পর নিয়মিতভাবে বছরে অন্তত দুবার বর্ষার প্রারম্ভে (মে-জুন) এবং শরতের শেষে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) গবাদি পশুতে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- জলজ স্যাঁতসেঁতে (Marshy land) এলাকায় গবাদিপশু চরানোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- সংক্রমণক্ষম পরজীবীর লার্ভা দূরীকরণে কাটা ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ ভালোভাবে ধৌত করতে হবে। খড় বা সাইলেজ তৈরি করে খাওয়ালে ভালফল পাওয়া যায়।
- রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে মাঠে বা অন্য এলাকায় এক সাথে গবাদিপশু চরানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- বাংলাদেশের যে সব এলাকায় ব্যাপক পরজীবী আক্রমণের আশংকা আছে সেখানে গবাদিপশুর জন্য আবদ্ধ পালন (Stall-feeding) পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।
- গবাদিপশুর গোবর স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সৎকার (Dispose) করতে হবে।
- গবাদিপশুর খামারের পাশে বা গ্রামে যে সকল জলাবদ্ধ এলাকা রয়েছে সেখানে শামুক নিধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা সেসব এলাকায় গবাদিপশু চরানো বন্ধ রাখার জন্য বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া যেতে পারে।
- গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য খাবারের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করতে হবে।

উপকারিতা

বেশিরভাগ কৃমিনাশকই ব্যয়বহুল নয়। পশুতে কৃমিনাশক প্রয়োগ করলে তা পশুপালনকারীর জন্য খুবই সুফল বয়ে আনে। দেখা গেছে ব্যয়ের তুলনায় লাভের আনুপাতিক হার ১ঃ ১০ অর্থাৎ, কোনো কৃষক যদি কৃমিনাশকের জন্য ১ টাকা ব্যয় করে তবে সে দুধ ও মাংস বাবদ ১০ টাকা আয় করবে। পরিবেশের ওপর কোনো প্রকার বিরূপ প্রভাব নেই বরং, কৃমিনাশক পরিবেশকে পরজীবীর ডিম ও লার্ভা মুক্ত রেখে পশু ও মানুষকে পরজীবী মুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

সংরক্ষণ ও সতর্কতা

সঠিক মাত্রায় কৃমিনাশক প্রয়োগ করা হলে এর দ্বারা কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এটা মানুষের জন্য একটি বিষাক্ত ঔষধ। সুতরাং অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

পরজীবী মুক্তকরণের এই কৌশলটি নিয়মিতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে পশুকে পরজীবী মুক্ত রাখলে এদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়, যা কৃষকের প্রান্তিক আয়কে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। ফলে কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক ঃ ড. এম, জে, এফ, এ, তৈমুর, ড. ফজলুর রহমান,
ড. শাহ মোঃ জিকরুল হক চৌধুরী, ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান,
ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন ও ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম